ভাঙ্গড় আন্দোলনঃ জমি, গণতন্ত্র ও লড়াইয়ের ভবিষ্যত

প্রতীপ নাগ

ভাঙ্গড় আন্দোলন – কী, কেন, সূচনা কোথায়?

ভারত সরকারের 'নবরত্ন' সংস্থা পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (পিজিসিআইএল) এর প্রয়োজন ছিল ৪০০/২২০ কিলোভোল্ট বিদ্যুতের লাইন ও তার জন্য পাওয়ার সাব স্টেশন বসানোর। এই কারণে মোট ১৩ একর জমির দরকার ছিল পিজিসিআইএল -এর। বলা হয়েছিল, ঐ সাবস্টেশন থেকে আটটা অন্তর্মুখী এবং আটটা বহির্মুখী লাইন যাবে, এবং লাইনগুলোর জন্য দরকার অনেক খুঁটি পোঁতার, এবং অনেক জমি।

২০১৩ সালে পিজিসিআইএল তার কাজ শুরু করে – ১৩ একর জমির উপর সাব স্টেশন তৈরীর কাজ। এখান থেকেই সমস্যার সূত্রপাত। পরিবেশ কতটা বিপন্ন হচ্ছে, সেটা গোড়ার কথা নয়। গোড়ার কথা জমির অধিকার, এবং সেটা কীভাবে লঙ্ঘন করা হল। সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, দাদরি সহ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে চাষীরা বহুজাতিক, দেশীয় বড় পুঁজি এবং নির্মাণশিল্পের পুঁজির স্বার্থে যে সব জমি দখল হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিল, এবং প্রধানত ঐ আন্দোলনের ফলেই, ২০১৩ সালে নতুন ধাঁচের জমি অধিগ্রহণ আইন (The Right To Fair Compensation and Transparency in land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013) পাশ হয়। কিন্তু সেই আইনের প্রয়োগপদ্ধতি বিষয়ক নিয়মগুলো গেজেটভুক্ত হতে হতে ২০১৪-র গোড়া হয়ে যায়। আর পশ্চিমবঙ্গের সরকারের সহযোগিতায়, তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা তথা ভাঙ্গড় এলাকার বৃহত্তম গুন্ডাবাহিনীর মাতব্বর, আরাবুল ইসলামের মাফিয়াদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে, ঐ জমি দখল হয় ২০১৩-র শেষ থেকে, পুরোনো আইনের সাহায্যে, যে আইনের বিরুদ্ধে সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, লালগড়ে কৃষক –আদিবাসী আন্দোলন হয়েছিল। ভাঙ্গড়ের মানুষ প্রধানত কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবী । ভাঙ্গড়ের জমি অত্যন্ত উর্বর - তিন ও চার ফসলি। তাদের অনেকে অনিচ্ছুক ছিল, এবং আরো অনেকে বিষয়টা সম্পর্কেকে স্পষ্টভাবে ওয়াকিবহাল ছিল না। তাদের কাউকে বন্দুকের ডগায় সই করতে বাধ্য করা হয়, কাউকে বলা হয়, সে টাকা না নিলেও জমি দখল হবে, টাকাটা জমা পড়বে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে। সাব স্টেশনের জন্য যে জমি অধিগ্রহণ করা হল তাতে ছিল ওয়াকফ বোর্ডের জমিও। সেটা কোন আইনে দখল করা হয়েছে তা আজও অজানা। সংবহন লাইনের জন্য এ জমির প্রয়োজন বলে অধিগ্রহণ করা হয়, তা হয়েছিল টেলিগ্রাফ আইন অনুযায়ী। এই আইনটি ১৮২৮ সালের আইন, এবং ২০০৩ এবং ২০০৬ সালে কিছু সংশোধনের পরও এটা কৃষক বিরোধী।

পাওয়ার গ্রিড সাব স্টেশনে মাটি ফেলার ঠিকা থেকে বিদ্যুতের সংবহন লাইনের খুঁটি পোঁতা এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ, চেক বিলি করা, সব কিছুর দায়িত্ব ছিল ঐ এক এবং অদ্বিতীয় আরাবুল ইসলামের। তার কাজে মদত দেওয়ার জন্য ছায়াসঙ্গী ছিল স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন। তারপর ২০১৩-র ডিসেম্বর

মাসে স্থানীয় পোলেরহাট ২ নং পঞ্চায়েত (যার প্রধান আরাবুলের সুযোগ্য পুত্র হাকিমুল) থেকে নোটিশ দেওয়া হয় বিডিও অফিস থেকে চেক নেওয়ার জন্য। চাপে পড়ে কেউ কেউ চেক নিলেও, আরাবুলের অত্যাচারই ছিল তার মূল কারণ। বাস্তব সম্মতি তাদের ছিল না। আর বহুদিন ধরে চলা আরাবুলের তান্ডব, জোর করে জমি দখলের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ, এবং সাব-স্টেশন থেকে পাল্টে উচ্চবিভবসম্পন্ন পাওয়ার গ্রিড নির্মাণের ফলে সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাবের সংশয় ও আতঙ্কে এলাকার মানুষ গড়ে তুললেন 'জমি, জীবিকা, বাস্তুতন্ত্র ও পরিবেশ রক্ষা কমিটি'। এরপরই আসে প্রকাশ্য লড়াই। প্রশাসনের দরজায় বারবার কড়া নেড়ে সাড়া না পেয়ে রাস্তা অবরোধ হয়। আন্দোলন গণচরিত্র ধারণ করার সঙ্গে সঙ্গে নেমে আসে চূড়ান্ত দমন-পীড়ন।

এখানে একটা বিষয় লক্ষ্যণীয়। সিঙ্গুর এবং নন্দীগ্রামের ক্ষেত্রে, যদিও লালগড়ের ক্ষেত্রে নয়, বামফ্রন্ট সরকারের জমি দখলকারী ভূমিকার বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন হলে দেখা গিয়েছিল, ঐ সরকার কখনো আলোচনা, কখনো বলপ্রয়োগ, এই ভাবে এগিয়েছিল। সেদিন যে আন্দোলন হয়েছিল, তাকে কীভাবে ভোটের বাক্সে ঠেলা যায়, সেটা ছিল উগ্র দক্ষিণপন্থী দল তৃণমূল কংগ্রেসের চেষ্টা। সেদিন যে কোনো কৌশলে সিপিআই(এম) বধে সচেষ্ট বিপ্লবীরা সেই তৃণমূলী প্রয়াসকেও অনেকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমর্থন করেছিলেন। আমাদের বক্তব্য এই না, যে বামফ্রন্ট সরকার জমি দখল করে ভাল কাজ বা গণতান্ত্রিক কাজ করেছিল। আমরা সেদিনও আন্দোলনের সঙ্গে ছিলাম, আজও আছি। কিন্তু আমরা সেদিনই স্পষ্ট বলেছিলাম, তৃণমূল একটি উগ্র দক্ষিণপন্থী দল, এবং বামফ্রন্টের বদলে তারা ক্ষমতায় এলে উন্নতি তো হবেই না, বরং খারাপই হবে। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনীতি এক কথায় কমিউনিস্টবিদ্বেষী। এই বিদ্বেষ থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির সঙ্গে ছিলেন এবং ২০০২-এর গুজরাত গণহত্যার সময়ে নীরব ছিলেন। এনডিএ-র জোটসঙ্গী হিসেবে তিনি ও তাঁর দল তাদের এসইজেড নীতির সঙ্গে যুক্ত। তাঁর রাজনৈতিক জনকের নাম সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় – বামপন্থী কর্মী নিধনের জন্য যার রাজ কুখ্যাত। ফলে, ভাঙ্গড়ের আন্দোলনকারীদের সাথে কোনো স্তরেই আলোচনা করা হয় নি। শ্রীমতি বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচনা কথাটার অর্থই সম্ভবত বোঝেন না।.গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কোনো সুযোগ তিনি দিতেই প্রস্তুত না। পুলিশের গুলিতে তাই প্রাণ হারালেন দুজন। আহত হয়েছে অসংখ্য।

জমির লড়াই

২০০৬ সালের নির্বাচনে সম্পূর্ণ ভরাডুবির পর জমির আন্দোলনের কাঁধে ভর করে, এবং ওই আন্দোলনে সহমর্মিতা জানাচ্ছিল যত দল, গণসংগঠন, বুদ্ধিজীবী ও ব্যক্তিমানুষ, তাদের আক্রোশ ভাঙিয়ে, ২০১১ সালে তুমুলভাবে ভোটে জয়ী হল তৃণমূল কংগ্রেস। ফলে গোড়াতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটা ভেক ধারণ করতে হয়েছিল, যে সরকার জমি অধিগ্রহণ করবে না, এবং মানুষ না চাইলে জমি নেওয়া হবে না। বাস্তবে, এর মানে দাড়ালো আরাবুল বাহিনীর হুমকির মাধ্যমে মানুষের "সম্মতি"। ভাঙ্গড়ের আন্দোলনরত গ্রামবাসীরা বারুইপুর এসডিও অফিসে ডেপুটেশন দিয়েছেন। কয়েক হাজার গ্রামবাসী রাজ্যপালকে ডেপুটেশন দিতে কলকাতায় জমায়েত করেছেন। ২৫,০০০ কৃষকের স্বাক্ষর সম্বলিত চিঠি নবান্নে জমা পড়েছে। ১৫০ জন কৃষক

পাওয়ার গ্রিডের জন্য জোর করে জমি কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে এফআইআর করেছে। অথচ সরকার ও আমলাতন্ত্র নীরব – বা ঠিকভাবে বললে, এই কৃষকদের কণ্ঠকে অস্বীকার করে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রী টুইটারে ও বিধানসভায় ঘোষণা করেন—মানুষ না চাইলে পাওয়ার গ্রিড হবে না। কিন্তু ভোজেরহাটের সাম্প্রতিক সভায় তিনি অন্য সুরে গান গাইলেন। আন্দোলনের প্রতি যারা সংহতি জানাচ্ছেন, বিশেষ করে যারা প্রকাশ্য সহায়তা করেছে, তাদের বললেন 'বহিরাগত' – ঠিক যে কথা আগেও শোনা গিয়েছে অন্যান্য শাসকদের মুখে। মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেছেন, আন্দোলনে মদত দিচ্ছে জমি মাফিয়া, আন্দোলনের জন্য টাকা আসছে ভেনেজুয়েলা থেকে।

আসুন, একটু খুটিয়ে দেখা যাক জমির প্রসঙ্গটা। ১৯৯১ সালকে ভারতে নয়া-উদারবাদী ধাঁচের ধনতন্ত্রের সূচনা হিসেবে ধরলে, তখন থেকে যে ২৬ বছর কেটেছে, তাতে আমরা কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। রিয়েল এস্টেটের নামে ফাটকা, অর্থাৎ জমি ও আবাসন নির্মাণ থেকে মুনাফা কামানো, বিপুল ভাবে বেড়েছে। সেই সঙ্গে শহুরে উচ্চবিত্ত-উচ্চ মধ্যবিত্ত স্তরের মানুষের অবাধ ব্যাপ্তি ঘটেছে। এদের চাই হাজার রকম বিলাস – তাই বড় বড় শপিং মল, দামী আবাসন, বিলাসবহুল রিসর্ট একের পর এক গড়ে উঠেছে। এদের মধ্যে আছে শহর থেকে স্বল্প দূরত্বে ভাঙ্গড়-রাজারহাটে বৈদিক ভিলেজ। এই বৈদিক ভিলেজ অবশ্যই জমি মাফিয়াদের মদতে তৈরী। সেই জমি দখলের কারিগরদের নাম আরাবুল ও মাটি গফফর। আরাবুল বাহিনীর তান্ডবে বৈদিক ভিলেজ নির্মাণের জন্য জমি দখলকে কেন্দ্র করে হিংসায় প্রাণ হারায় এক নিরীহ যুবক। মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু সেদিন কোনো জমি মাফিয়ার নিন্দা করেন নি। বস্তুত, ২০১১ সাল থেকে এ রাজ্যে ক্ষমতাসীন তো তৃণমূল কংগ্রেস। জমি নিয়ে রাজ্যের বহু জায়গায় জমি মাফিয়াদের দাপট, নির্মাণকার্যে সিন্ডিকেটদের যে দাপট, তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে তৃণমূল কংগ্রেসের বড়-মেজ-ছোটো নেতাদের নাম।

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম পর্বে তখনকার বিরোধী দলনেত্রীর ভূমিকায় আজকের মুখ্যমন্ত্রী বারবার ১৮৯৪-এর ঔপনিবেশিক জমি অধিগ্রহণ আইন বাতিলের দাবী জানিয়েছিলেন। অথচ, ২০১৩ সালে নতুন জমি আইন ভারতের সংসদে পাশ হয়ে যাওয়ার পর, তার গেজেট নোটিফিকেশনের (১ জ্যানুয়ারি ২০১৪) ঠিক আগের দিন, চুপিসাড়ে সেই ১৮৯৪-এর কুখ্যাত আইন মোতাবেক ভাঙ্গড়ের জমি অধিগ্রহণ করা হল। এই না হলে সততার প্রতীক !

আসলে ভারতে নয়া-উদারবাদের পুঁজি সঞ্চয়নের ও মুনাফার এক বড় ক্ষেত্র হল জমি। জমির মাধ্যমে এক নতুন প্রজন্মের পুঁজিপতি তৈরি হচ্ছে। ভাঙ্গড়ের সবচেয়ে বড় প্রমোটার আজ তৃণমূল নেতা কাইজারের বাবা কবির আহমদ। ভাঙ্গড়ের বড় মাটি ব্যবসায়ী আরাবুলের ভাই। তাই জমি নেওয়া নিছক উন্নয়নের নামে হলেও, তার পিছনে একটা শ্রেণীগত রাজনীতি থাকে। সংস্কারবাদীরা যখন ক্ষমতায় যায়, তারা যে সরকার গড়ে তার মধ্যে একটা স্ববিরোধ থাকে – মুখে মেহনতী মানুষের কথা, কিন্তু সরকারে থাকার যুক্তিতেই শাসক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা। কিন্তু, কোনো দক্ষিণপন্থী দল ক্ষমতাসীন হলে সেই দ্বন্দ্ব থাকে না। সার্বজনীন ভোটাধিকার থাকলে "মানুষ", "জনগণ", এ সব শব্দ উচ্চারিত হতে পারে, কিন্তু তার বেশী কিছু নয়। তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর থেকে সেটা পদে পদে প্রমাণ করে চলেছে।

গণতন্ত্র ও তৃণমূল

গণতান্ত্রিক আন্দোলন মানে কী? গণতন্ত্র মানেই বা কী? তৃণমূল নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মনে করেন, তাঁর দল ভোটে জিতে গেলে পরবর্তী দশ বছর সকলকে চুপ করে বসে থাকতে হবে। কোনো সামাজিক প্রসঙ্গ নিয়ে কেউ কোনো কথা বললে তাঁর কয়েকটা বাছাই করা বিশেষণ আছে – মাওবাদী, সি পি আই(এম), বহিরাগত, ইত্যাদি। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে কেউ বহিরাগত না। মেধা পাটকারকে যখন বহিরাগত হিসেবে দেখাতে চেয়ে বিনয় কোঙাররা কদর্য কথা বলেছিলেন, আমরা প্রতিবাদে মুখর হয়েছিলাম। আজ তবে কেন শর্মিষ্ঠা চৌধুরী, প্রদীপ সিং ঠাকুর, কুশল দেবনাথ, শঙ্কর দাসরা বহিরাগত হবেন?

গণতন্ত্র মানে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধান-সূত্র নির্ধারণ। এমন কি, বামফ্রন্টের মধ্যে, সিপিআই(এম) ব্যতীত অন্য দলরা এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন, তাই সেই জমানায় জমি আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা প্রয়াত অশোক ঘোষ চেষ্টা করেছিলেন আলোচনা যেন হয়। তৃণমূল নেত্রী আজ কোনোরকম আলোচনার বিরোধী। ভাঙ্গড়ে চলেছে পুলিশ আর চটি-পুলিশের গুলি, আরাবুল-সব্যসাচী বাহিনীর তান্ডব। এক সময়ে টাডা-পোটার বিরোধী মুখ্যমন্ত্রী (মনে পড়ে কারো, অভিনেতা সঞ্জয় দত্তের ঘটনাতে তাঁর বক্তব্য) ক্ষমতায় আসার পর থেকে ইউএপিএ-র প্রবল অনুরাগী। তাই তো ছত্রধর মাহাতোর মামলা নতুন সরকারও চালিয়ে নিয়ে যায় ও তাঁর কঠিন সাজা ঘোষিত হয়। তাই তো ভাঙ্গড়ে একের পর এক মানুষের বিরুদ্ধে ইউএপিএ, এমপিও সহ বিভিন্ন আইন প্রয়োগ হয়, যে আইনগুলো দেশের খেটে খাওয়া মানুষের ওপর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদের নামান্তর।

রাষ্ট্রের সামাজিক কর্তব্য হওয়া উচিত নাগরিকদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসস্থান, চাকরি বা জীবিকা নিশ্চিত করা। তার বদলে, এসব কাজ থেকে হাত গুটিয়ে, নানা পদক্ষেপের মাধ্যমে জনগণের সম্পত্তি, যেমন ব্যাঙ্ক, বীমা, বিদ্যুৎ, হাসপাতাল প্রভৃতি জলের দরে বেসরকারী মালিকানায় হস্তান্তরিত করা হয়েছে। বেসরকারী বড়-মাঝারি পুঁজির মুনাফা বাড়ানোর জন্য এই পদক্ষেপগুলো র পাশাপাশি চলেছে পারিবারিক ও সামাজিক জীবন সুস্থভাবে কাটানোর পথ বন্ধ করা, মানুষের দীর্ঘদিনের অর্জিত সামাজিক ও গণতান্ত্রিক অধিকারগুলো ধ্বংস করা। আজ ভাঙ্গড়ে ইউএপিএ, কাল কলকাতায় মিছিলের উপর নিষেধাজ্ঞা, পরশু পার্বত্য এলাকায় ইন্টারনেট বন্ধ, তাতে সেখানের ছেলে মেয়েরা কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য আবেদন করতে না পারলে কীই বা এসে গেল? ওরা তো তৃণমূলকে ভোট দেয় নি। এর পরও এক তকমা দেওয়া হচ্ছে ‘মাওবাদী’, ‘বহিরাগত’, ‘দেশদ্রোহী’, ‘সন্ত্রাসবাদী’ ইত্যাদি। অর্থাৎ, গণতান্ত্রিক অধিকার ধ্বংস করাকেই বলা হচ্ছে গণতন্ত্র। আমাদের বুঝে নিতে হবে, ‘স্বাধীনতা সব সময়েই বিরোধী মত প্রকাশকারীদের স্বাধীনতা। ... যদি ‘স্বাধীনতা’ পরিণত হয় ‘বিশেষ সুবিধাতে’, তাহলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভেঙ্গে পড়ে’। (রোজা লুক্সেমবুর্গ)।

পিজিসিআইএল ও বিদ্যুৎ ক্ষেত্র

১৯৮৯ সালে তৈরী হওয়া নবরত্ন পিজিসিআইএল একটি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থা। এদের কাজ হল উচ্চবিভবসম্পন্ন বিদ্যুৎ সংবহন করা। নামে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব হলেও, বিশ্বায়ন-বেসরকারীকরণের এই জমানাতে এটা স্টক এক্সচেঞ্জে নথিভুক্ত। বর্তমানে এর সম্পত্তি প্রায় ২৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, বা এক লাখ আশি হাজার কোটি টাকা। এই সংস্থার শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে আছে বড় বড় বেসরকারী ব্যাঙ্ক ও আর্থ সংস্থা, যেমন আইসিআইসিআই প্রুডেন্সিয়াল, এইচডিএফসি ইক্যুইটি ফান্ড, বা টরেন্ট, জেপি প্রভৃতি। সুতরাং এই তথাকথিত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার প্রধান কাজ নিজের বড় বড় মুনাফাখোর শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থে দেশ জোড়া তার বিস্তার, বিদ্যুৎ সংবহনে একচেটিয়া অধিকার, এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থ নয়, মুনাফাকেই প্রাধান্য দেওয়া।

এইখানে চলে আসে কেন্দ্রীয় এবং অপেক্ষাকৃত প্রান্তিক পুঁজির রফার গল্প। পিজিসিআইএল কাজ করবে, পাওয়ার গ্রিড বসাবেই। সেটা আসলে বহুদিন আগে থেকে ঠিক করা। কিন্তু তাদের ওয়েবসাইটে নাম দেওয়া ছিল রাজারহাটের। সেটা যে কীভাবে ভাঙ্গড়ের খামারআইট গ্রামে চলে গেল তা নিয়ে পিজিসিআইএল আর "মা-মাটি-মানুষ"-এর সরকার, দুজনেই চুপ । আসলে রাজারহাটে জমির আকাশছোয়া মূল্য। ওখানে পাওয়ার গ্রিড বসলে একদিকে পিজিসিআইএলকে বেশী টাকা খেসারত গুনতে হবে, আর অন্যদিকে একবার পাওয়ার গ্রিড বসলে বা বসা নিশ্চিত হয়ে গেলেই, ওখানকার জমির দাম বাড়া বন্ধ হবে, এমন কি পড়তে থাকবে। সিন্ডিকেট বাহিনীর বিপুল মুনাফায় টান পড়বে তাহলে।

মুখ্যমন্ত্রী বারেবারে বলেছেন, ভাঙ্গড় ও সন্নিহিত অঞ্চলে 'লো-ভোল্টেজ' দূর হবে এই পাওয়ার গ্রিড সাব স্টেশন স্থাপন হলে। তিনি সম্পূর্ণ মিথ্যার বেসাতি করছেন। 'লো-ভোল্টেজ' দূর করার জন্য দরকার ট্রান্সফর্মার বসানো, এবং ট্রান্সফর্মার ও সংবহনকারী তারের রক্ষণাবেক্ষণ। ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ পর্ষদকে তিন ভাগে বিভক্ত করে, সংবহনের কাজ সস্তায় করার জন্য খোলা হয়েছে ওয়েস্টবেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড। এতে স্থায়ী কর্মী নিয়োগ বন্ধ, কর্মীর সংখ্যা অপ্রতুল। ঠিকা কর্মীদের দিয়েই কাজ চলে প্রধানত। বোঝাই যাচ্ছে, গ্রাম বাংলার মানুষকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে আসলে এই সরকার কতটুকু উৎসাহী।

পিজিসিআইএল-এর কাজ সম্পর্কে আরো কিছু কথা বলা দরকার।

১। তাদের নিজেদের ওয়েবসাইটে তারা লিখেছে, স্বচ্ছতার সঙ্গে স্থানীয় মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তারা তাদের প্রকল্পকে বাস্তবায়িত করবে। যেখানে গত বছর নভেম্বর থেকে খোলাখুলি বিরোধিতার পথ ধরেছেন মানুষ, সেখানে তারা কেন দ্বিতীয়বার ভাবতে, আলোচনায় বসতে রাজী হল না কেন? বিনা শর্তে যারা কাগজে সই করে তারাই কেবল স্থানীয় মানুষ, আর প্রতিবাদ করলেই বুঝি হয় সন্ত্রাসবাদী না হলে বহিরাগত?

২। কৃষকরা অনেকেই বলেছেন, তাদের শাসকদলের পার্টি অফিসে নিয়ে গিয়ে বন্দুকের ডগায় ভয় দেখিয়ে স্ট্যাম্প পেপারে সই করতে বাধ্য করা হয়। এ নিয়ে কাশিপুর থানাতে একাধিক অভিযোগও করা হয়েছে।

রাজ্য সরকার না হয় নীরব। কিন্তু পিজিসিআইএল কর্তৃপক্ষও কি এই গুন্ডাগর্দীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েনি, যখন কৃষকদের এই অভিযোগ এবং টাকা ফিরিয়ে দিতে চাওয়াকে তোয়াক্কা না করে তারা কাজ চালিয়ে যাচ্ছে?

৩। পিজিসিআইএল একটি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থা। তার কর্ণধাররা কীভাবে আইন ভাঙ্গার সঙ্গে থাকে? অথচ, সাব স্টেশনটির জন্য যে কৃষিজমি জবরদখল হয়েছে, www.banglarbhumi.gov.in ওয়েবসাইটে সেই জমিকে এখনও উর্বর কৃষিজমি হিসেবেই দেখানো আছে। জমির চরিত্র যেখানে তাই, সেখানে ঐ জমির উপর কোনো প্রকল্প কীভাবে শুরু হল? জমি আইন ভাঙ্গার দায় কি কিছুটা পিজিসিআইএল-এর নয়?

৪। জমি অধিগ্রহণের আগে নতুন আইন অনুযায়ী গ্রামসভা, জনশুনানি, সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা, খাদ্যনিরাপত্তা, বিভিন্ন বিষয় দেখার পরই অধিগ্রহণের কথা বলেছে। এ সব কিছু হয় নি জেনেও পিজিসিআইএল চুপ। দেখাই যাচ্ছে, আইন লঙ্ঘনে এই রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থার সহমত রয়েছে।

পরিবেশ ও বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ

আমরা পরিবেশ সংক্রান্ত বিতর্কে বেশীদূর যাব না, এবং তার প্রথম ও প্রধান কারণ হল, এই আন্দোলন সবার আগে জমি রক্ষার ও গণতন্ত্রের লড়াই। বিষয়টা এমন না, যে পাওয়ার গ্রিড পরিবেশের ক্ষতি না করলেই আমরা সেটার নির্মাণ মেনে নিতাম। আমরা যে এই লড়াইয়ের সঙ্গী, তার কারণ এলাকার মানুষ জমি ফিরে চাইছেন।

কিন্তু তারপরও কিছু কথা থেকে যায়। রাজ্য সরকার এবং পিজিসিআইএল বারবার বলে যাচ্ছে, উচ্চবিভবসম্পন্ন বিদ্যুৎ সংবহন লাইনে কোনো ক্ষতি হয় না। অথচ 'এই সময়' পত্রিকাতে ২৯ ডিসেম্বর ২০১৬, পিজিসিআইএল এক বিজ্ঞাপনে জানিয়েছে, তারে বিদ্যুৎ সংযোগ হওয়ার পর ট্রান্সমিশন লাইনের তলায় ও পাশে কোনো ধাতব পদার্থ নিয়ে গেলে, বাঁশ পুতলে বা বাড়ি করলে কোনও দুর্ঘটনার জন্য কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়। তাহলে মানুষ চাষ করবে কোথায়? একটা নমুনা দিয়ে বোঝানো যাক কতটা ক্ষতি হবে। ৪০০/২২০ কেভি বিদ্যুৎ লাইনের দুটি খুঁটির মধ্যে ব্যবধান ২৫ থেকে ৩০ মিটার। ট্রান্সমিশন লাইনের মধ্যবর্তী বিন্দু থেকে দুদিকে ২৬ x ২ = ৫২ মিটার জায়গায় কোনোরকম কাজ করা যাবে না। মোটামুটিভাবে দুটি খুঁটির মধ্যে গড়ে ১২৫০ থেকে ১৫০০ বর্গমিটার জমিতে চাষ-আবাদ, বাড়িঘর তোলা, কিছুই করা যাবে না। ১৬টি সংবহন লাইনের ফলে কি বিপুল জমি নষ্ট হবে, এবং চাষের ক্ষেত্রে ঝুকি বাড়বে, সে বিষয়টা ভাবার মত।

পাঞ্জাবে রাজাসামসি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৩টি গ্রামে হাইটেনশন তারের বিদ্যুৎ ঝলকানিতে প্রায় ৩০০ একর গম পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এর কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে পাওয়ার সাবস্টেশনে শর্টসার্কিট। প্রায় এক কোটি টাকার ফসলের ক্ষতি হয়েছে। বোঝা যায়, উচ্চবিভবসম্পন্ন বিদ্যুতের মধ্যে বিপদ একেবারে নেই তা নয়। (তথ্যসূত্র—টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ২৩ এপ্রিল)।

আর একটা কথা বোঝা জরুরী। বিজ্ঞানসম্মতভাবে চলার কথা যদি ওঠে, তাহলে আমাদের বোঝা দরকার, বিদ্যুৎ উৎপাদন কীভাবে করব, কেন করব? প্রথম কথা, কয়লা ব্যবহার, ঠিক নিউক্লিয়ার শক্তি ব্যবহারের

মতই, বর্জনীয়। বিশ্ব-উষ্ণায়ন বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং কমাতে হলে চাই অন্যান্য পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন। কিন্তু মোদীর মেক ইন ইন্ডিয়ার মর্মার্থ হল ভারতীয় বড় পুঁজির এবং আন্তর্জাতিক পুঁজির হাতে পরিষেবা ব্যবস্থাটা তুলে দেওয়া। গৌতম আদানি স্টেট ব্যাঙ্কের সাহায্যে অস্ট্রেলিয়া থেকে কয়লা কিনবে। পাওয়ার সেক্টর যদি মেক ইন ইন্ডিয়াতে না ঢোকে, তবে তার মুনাফা হবে কীভাবে? দ্বিতীয়ত, পাওয়ার গ্রিড কেন? আমরা জানি, কয়েক বছর আগে, নর্দান গ্রিডে গোলযোগের ফলে কতগুলো রাজ্যে একই সঙ্গে হাহাকার দেখা দিয়েছিল। কিন্তু তবুও কেন্দ্রীভূত গ্রিড চাই, যাতে বড় পুঁজি সারা দেশে সরবরাহ করে, এমনকি গোটা সার্ক-এলাকাতে সরবরাহ করে,আর মুনাফা কামাতে পারে। অথচ, নানা অজুহাতে বিদ্যুতের দাম বাড়িয়ে নাভিশ্বাস উঠেছে সাধারণ মানুষের।

রাজনৈতিক লড়াই দীর্ঘ, চাই যুক্তফ্রন্ট এবং স্বাধীনতা

কেন্দ্র এবং রাজ্য, দু'জায়গাতেই প্রবল দক্ষিণপন্থী শক্তি আজ ক্ষমতাসীন। তারা পুঁজির স্বার্থে যেমন লড়ছে, তেমনি লড়ছে মেহনতী মানুষকে বিভক্ত, বিচ্ছিন্ন করতে। তাই সাম্প্রদায়িকতাবাদ বিরোধী লড়াই আর শ্রেণী সংগ্রাম দুটি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন লড়াই নয়, বরং একটার সঙ্গে আরেকটা নিবিড়ভাবে যুক্ত। এটা লক্ষ্যণীয়, যে এই একটা লড়াই, যেখানে বিজেপি নীরব। হিন্দু ও মুসলিম চাষী একজোট হয়ে লড়ছেন, হিন্দু ও মুসলিম সিন্ডিকেট-গুন্ডা-পুঁজিপতি- দালালদের বিরুদ্ধে। আমরা বলি না, যে স্বতন্ত্রভাবে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী লড়াই বা স্লোগানের দরকার নেই। বরং তার উলটোটাই সত্য। আমরা দীর্ঘকাল এই লড়াই চালিয়ে গেছি। কিন্তু আমরা অবশ্যই বলি, ফ্যাসিবাদের উদ্দেশ্য একদিকে যেমন তার নিজের বাছাই করা শত্রু নিধন, তেমনি তার উদ্দেশ্য শ্রমিকশ্রেণীকে দমন করা। আর যদি শ্রেণী নিজেকে শ্রেণী বলে না ভেবে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, দলিত, উচুজাত বনাম "ছোটোলোক", হিন্দু বনাম মুসলিম বনাম শিখ এইভাবে ভাবতে থাকে, তা হলে তো কেল্লা ফতে। কায়েমি স্বার্থে আঘাত লাগে যখন ঐক্যবদ্ধ গণ আন্দোলন হয়। তখন এ রাজ্যের স্বৈরাচারী সরকার ও শাসক দল চূড়ান্ত দমন-পীড়নের পথ ধরে।

এর বিরুদ্ধে চাই বৃহত্তম যৌথ লড়াই। আর সেখানেই নানা রকম কিন্তু-কিন্তু উঠছে। স্পষ্টভাবেই বলা দরকার – আমরা কি এখানে সিপিআই(এম) সহ বামফ্রন্টের সব দলের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট করব? আসলে, যুক্তফ্রন্টের অর্থ না বুঝলে গোলমাল হবেই। যুক্তফ্রন্ট তার সঙ্গেই করার প্রশ্ন ওঠে, যার সঙ্গে মৌলিক ক্ষেত্রে বিরোধ আছে, কিন্তু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে জোটের সুযোগ আছে। আমাদের কাছে এটা স্পষ্ট, এবং আমরা অতীতে বিস্তারিত ভাবে লিখেছি, যে সিপিআই(এম) হল সংস্কারবাদী শ্রমিক দল। তারা বুর্জোয়া ব্যবস্থার মধ্যেই থাকতে চায়। তারা বুর্জোয়া ব্যবস্থাতে সরকারে যেতে চায়। তারা সরকারে গেলে বুর্জোয়া অর্থনীতির আপন গতি তাদের ঠেলে দেবে নানা শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী কাজের দিকেও। এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এই দলগুলো, আজও, শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠিত যে অংশ, তাদের মধ্যে এক বড় অংশের সমর্থন পায়। নির্দিষ্টভাবে ভাঙ্গড়ে, স্থানীয় মানুষের কমিটিতেও এদের স্থান রয়েছে।

কেউ কেউ এর উত্তরে দাবী করেছেন, সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের অপরাধ স্বীকার করতে হবে তাদের। তারা তো সেটা একমুখে স্বীকার করে (পার্টি দলিলে) আবার আরেক মুখে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয় (গৌতম দেবের ২০১৬-র নির্বাচনী প্রচার)। তাই এরকম অবাস্তব দাবী তোলা অর্থহীন। সিপিআই(এম) কেন সংস্কারবাদ ত্যাগ করছে না, এমন দাবী করে আমরা তাদের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট কেন করব?

কিন্তু তাই, নিজের মঞ্চ থেকে আমরা আমাদের কথা বলা থামাব না। আমরা শ্রমিক শ্রেণীকে নিশ্চয়ই বলব, এরা কেন সংস্কারবাদী। তাহলে কেন সঙ্গে আছি? থাকতে হবে, কারণ এদের নেতারা নয়, কিন্তু নেতাদের পুরো এড়িয়ে গেলে যে কর্মী-সমর্থকদের কাছে পৌছনো যাবে না।

কেউ কেউ এর জবাবে বলতে চেয়েছেন, গণ আন্দোলনে জোট হতে পারে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নয়। কথাটা ভাল করে ভেবে দেখা উচিত। গণ আন্দোলন, শ্রেণী সংগ্রাম, এসব কি রাজনীতি নয়? তাহলে কি আমরাও রাজনীতি বলতে কেবল ভোট বুঝব? মূল রণনীতি, এমনকি প্রধান রণকৌশলগুলোর ক্ষেত্রেও, সিপিআই(এম) নিশ্চয় বিপ্লবী লাইন নেবে না, নেয় নি। তাদের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সবসময়েই হওয়ার কথা উঠতে পারে এই প্রভেদ মেনে নিয়ে, মাথায় রেখে। তিনটি বিপ্লবী গোষ্ঠী যখন জোট করে, তারা মনে করতে পারে, এর ফলে একদিন তারা ঐক্যবদ্ধ হবে। সিপিআই(এম) এর সঙ্গে সে সম্ভাবনা নেই। কিন্তু লড়াইগুলো রাজনৈতিক হতেই পারে। সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী, ফ্যাসীবিরোধী লড়াইয়ে কেবল কিছু বিপ্লবী সংগঠন একলা হাটবেন, এটা কোনো কাজের কথা নয়। অথচ সঠিক ভাবে পরিচালিত হলে, ভাঙ্গড়ের মত লড়াই জমি রাখার তাৎক্ষণিক দাবী পেরিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ ভিত্তিতে মেহনতী মানুষের ঐক্য গড়তে পারে। গণ আন্দোলনে বামপন্থীদের ঐক্য, পরিবেশবাদী, নারীবাদী, দলিত আন্দোলনদের যুক্ত করে সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই-ই পরাজিত করতে পারে ফ্যাসিবাদী ও স্বৈরাচারী রাজনীতিকে।

শেষের কথা

ভাঙড়ের আন্দোলন এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। ৯ মাসের ওপর রক্ত চোখ উপেক্ষা করে, অপকৌশল ও গ্রেফতারির মুখে দাঁড়িয়েও লড়াইয়ের ঐক্য ও মনোবল অটুট রেখেছে ভাঙড়ের মানুষ। সাহস যোগাচ্ছে ভাবাদিঘি, ১৬ বিঘা, মালদার জমি - জীবিকার আন্দোলনগুলোকে। এই অসম ও কঠিন লড়াইয়ে যা প্রয়োজন, যেমন ঐক্য, নিজস্ব সংগঠন ও দৃঢ়তা তা ভাঙড়ের মানুষ অর্জন করেছে। পাওয়ার গ্রিডের বাইরে জীবন-জীবিকার অন্যান্য বিষয়কে যুক্ত করে নিজেদের সংগঠনের মধ্যে দিয়ে, সব প্রশ্নকে তলার স্তর থেকে নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপের মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে গেলে জিতবে এই লড়াই। এর সাথে অন্যান্য স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ ও জীবন-জীবিকার লড়াইগুলোর মধ্যে গড়ে তুলতে হবে পারস্পরিক সংহতি।

অন্যদিকে কয়েক মাস ধরে চলা এই আন্দোলনে বেশ কিছু অক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা ইতিমধ্যেই আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছি। গণআন্দোলনে বিপ্লবী, বাম ও অন্যান্য রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তিদের অংশগ্রহণের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, উপায়, শর্তাবলী ইত্যাদি নিয়ে কোনও বিস্তারিত আলোচনার মধ্যে যাওয়ার কোনও প্রচেষ্টা না করে শুধুমাত্র সাধারণভাবে কিছু অসামর্থের কথাই উল্লেখ করব।

ভাঙড়ের যে অঞ্চলের মানুষেরা এই লড়াইতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তারা প্রথম থেকেই চেয়েছিলেন বাইরের ব্যাপকতম অংশের মানুষ তাদের লড়াইয়ের পাশে থাকুক, সমস্ত রাজনৈতিক সামাজিক সংগঠন তাদের সকল শক্তি দিয়ে ঐ আন্দোলনকে মদত দিক এবং সর্বোপরি গণআন্দোলনের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ শক্তিসমূহ তাদের লড়াইয়ের নেতৃত্ব দিক। তাদের এই চাওয়াকে মর্যাদা দিয়ে এবং সামগ্রিকভাবে আন্দোলনের সঠিক অগ্রগতির স্বার্থে সচেতন রাজনৈতিক কর্মীদের অবশ্যই এগিয়ে আসা উচিৎ এবং তা আমরা তা করতে পেরেছি। এ কাজ করতে গিয়ে অনেককেই রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন, মিথ্যা মামলা, জেল ইত্যাদি মোকাবিলা করতে হচ্ছে। আমরা এতে কোনমতেই দমছি না। কিন্তু সচেতন অংশকে জনগণের তাৎক্ষণিক চেতনায় ভেসে আন্দোলনে অংশ নেওয়া অথবা নেতৃত্বের অবস্থান থেকে একতরফা নিজেদের উদ্দেশ্য চাপিয়ে দেওয়া, কোনওটাই গণআন্দোলন বিকশের সহায়ক নয়। এই ব্যাপারে আমাদের প্রয়োজনীয় ভারসাম্যের অভাব ছিল বলেই আমাদের অভিমত। শুরুর জন্য পাওয়ারগ্রিডের প্রশ্ন নিয়ে আন্দোলনের স্বাভাবিক জন্ম হলেও, গভীরতর বিষয় ছিল জমি, জমি মাফিয়া এবং জুলুমবাজি। পাওয়ারগ্রিডের দাবিকে রেখেই ঐ জমি সংক্রান্ত প্রশ্নকে ক্রমশ আন্দোলনের কেন্দ্রে নিয়ে আসার দরকার ছিল। তা না করতে পারায়, একদিকে যেমন আন্দোলন একটা সীমিত অংশের মানুষের মধ্যে সাময়িক ভাবে দৃঢ় ও মজবুত হয়েছে, তেমনই অন্যদিকে পাওয়ারগ্রিডের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে ভুক্তভোগী নয় এরকম ব্যাপক অংশের মানুষের অংশগ্রহণ ক্রমশ কমে গিয়েছে। ভারসাম্য বজায় রাখতে পারলে হয়তো সুবিধাভোগী অংশ সময়ের সাথে আন্দোলন থেকে একটু একটু করে সরে যেত কিন্তু স্থানীয় স্তরের পরিধির বাইরের ব্যাপক মানুষ আরও জোরালোভাবে সামিল হত। একটা স্থানীয় ইস্যুর আন্দোলন থেকে বৃহত্তর সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনে উত্তরণ ঘটতে পারত। এই ক্ষেত্রে সেই সুযোগ ছিল। আর এতেই দীর্ঘমেয়াদে এই আন্দোলন তার টিকে থাকার প্রয়োজনীয় রসদ পেত। আমরা যে অংশকে ধরে রাখতে জমির প্রশ্নকে কেন্দ্রীয় বিষয় হিসাবে তুলে ধরতে অক্ষম হয়েছি, তারা এমনিতেও কতটা নির্ভরযোগ্য শক্তি তা নিয়ে গভীর সন্দেহ আছে। তাদের আপোষের পথে হাঁটা ব্যতিক্রমী ঘটনা নয়।

আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে দাবি আদায় বা অনাদায়কে সবসময় আন্দোলন সফল বা ব্যর্থ হওয়ার একমাত্র মাপকাঠি করলে সমূহ বিপদ, কারণ সেই মাপকাঠিতে অধিকাংশ আন্দোলনই ব্যর্থ হতে এবং তার ফলে হতাশার জন্ম দিতে বাধ্য। সচেতন রাজনৈতিক কর্মীর কাছে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারিদের সাহস, দৃঢ়তা, মরণপণ লড়াইয়ের মানসিকতা বড় পুঁজি, কিন্তু তার চেয়েও দামি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত মানুষের পরিবর্তনকামি রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ। সমস্যা হল যে আন্দোলনের ভৌগোলিক, সামাজিক, বিষয়গত ক্ষুদ্রতা ও সীমাবদ্ধতা আন্দোলনকারিদের ঐ চেতনার বিকাশের পথে প্রধান অন্তরায়। আমরা বক্তৃতা, ইত্যাদিতে যাই বলি না কেন, আমাদের মনে হয়, বাস্তবে লড়াই-আন্দোলন পরিচালনার কৌশল গ্রহণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আন্দোলনকারিদের সংগ্রামি মানসিকতাকেই বড় বেশি ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখে ফেলেছি।

আন্দোলনের সমর্থনের ভিত্তিকে প্রসারিত করার ও বিভিন্ন শক্তিকে লড়াইয়ে সামিল করানোর ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষ থেকে যেমন আন্তরিক প্রয়াসের অভাব দেখা গিয়েছে, তেমনই সময়ে সময়ে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী অভিব্যক্ত হয়েছে এবং এব্যাপারে দক্ষতার চূড়ান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। এই প্রশ্নে এখনও কার্যকরি কোনও পদ্ধতির উদ্ভাবন ঘটানো সম্ভব হয় নি। শুধু আন্দোলনের নেতৃত্বই নয়। যারা এমনকি সহায়ক বা সমর্থনকারী হিসেবে এগিয়ে এসেছে, তাদের একটা বড় অংশ, বিশেষত বড় শক্তিরাও দেশ-দুনিয়ার হাল-হকিকতের সামগ্রিকতায় এই আন্দোলনের গুরুত্ব বুঝতে না পেরে অথবা বুঝতে না চেয়েই অংশ নিয়েছে। নিজেদের দল বা সংগঠনের মধ্যেও তারা এই আন্দোলনের গুরুত্ব বোঝাতে পারেনি অথবা চায় নি। ফলে তাদের অংশগ্রহণ থেকেছে খন্ডিত ও আনুষ্ঠানিক।

সর্বোপরি, আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অন্যতম যে শর্ত, অর্থাৎ প্রতিপক্ষ সম্পর্কে সার্বিক ও সম্যক বোঝাপড়া তা বুঝতেও আমরা বহু সময় ব্যার্থ হয়েছি। সরকার যখন তার আয়ত্তে থাকা সমস্ত কৌশল-অপকৌশলের সম্পূর্ণ সদ্ব্যাবহার করে চলেছে আন্দোলনকে ভাঙার জন্য, তখন আমরা আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি কার্যত একরৈখিক রেখে যান্ত্রিকভাবে মিছিল-সমাবেশের গতানুগতিকতার মধ্যেই ঘুরপাক খেয়েছি।

আশা রাখি যে গত সাত-আট মাসে আন্দোলনের পথ চলার মধ্যে দিয়ে যে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পেরেছি তাকে পাথেয় করে এই গুরুত্বপূর্ণ লড়াইকে তার কাঙ্খিত পরিণতিতে পৌঁছানর আন্তরিক প্রয়াস নেব। একমাত্র সেই পথেই এই আন্দোলন কাঙ্ক্ষিত জয় হাসিল করবে এবং শ্রেণী রাজনীতির ভারসাম্যেরও পরিবর্তন ঘটানোর সম্ভবনা জাগাতে পারে।